ভারত ইতিহাসে গুপ্তযুগকে "সুবর্ণ যুগ" বলে অভিহিত করা কতটা যুক্তিসঙ্গত।

গুপ্তযুগ প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনে এক গৌরবময় যুগ। এই যুগে রাজনৈতিক ঐক্যের পাশাপাশি সাহিত্য, শিল্পকলা, ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষের কথা চিন্তা করে গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' বলা হয়েছে। দেশীয় ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্তযুগকে প্রাচীন গ্রিসের পেরিক্লীয় যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিকাশের জন্য অনেকে এই যুগকে "Classical Age" বলেও অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ গুপ্তযুগকে "এলিজাবেথীয় যুগ" এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গুপ্তযুগে সাহিত্য ও দর্শনচর্চায় অগ্রগতি পরবর্তী প্রজন্মকে বিস্মিত করেছে। কাব্য ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের তুলনা ভারতের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। সংস্কৃত তথা ভারতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাকবি কালিদাস এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কালিদাস তাঁর কাব্য ও নাটক রচনার দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম সারিতে স্থান করে দেন। তাঁর মেঘদূত, কুমারসম্ভবম, রঘুবংশম, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এছাড়াও ভারবি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা গুপ্তযুগকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে গুপ্তযুগের চিন্তাবিদদের মৌলিক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গৌড়পাদের 'বেদান্ত দর্শন', অসঙ্গের 'যোগাচার শাস্ত্র', ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' তথা প্রসঙ্গে বলা যায়। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু এই যুগেই আবির্ভূত হন। গুপ্তযুগে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বৌদ্ধ দর্শনের পাশাপাশি ষড়দর্শনেরও স্থান ছিল।

কেবল সাহিত্য নয়, বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই যুগেই জন্মেছিলেন। আর্যভট্টের "সূর্যসিদ্ধান্ত" থেকে জানা যায় আহ্নিকগতি ও বার্ষিক গতির তত্ত্ব তথা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কথা।

বরাহমিহিরের লেখা গ্রন্থ থেকে গ্রিক-রোমান জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম হল 'বৃহৎসংহিতা' এবং 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'। গণিতশাস্ত্রের দশমিক পদ্ধতি গুপ্তযুগেই আবিষ্কৃত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও গুপ্তযুগে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ধাতু-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

গুপ্তযুগে চিকিৎসাবিজ্ঞান অবহেলিত ছিল না। এই যুগের দু'জন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন চরক ও সুশ্রুত। চিকিৎসাবিষয়ক তাঁদের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম হল 'চরক সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত সংহিতা'। সুশ্রুত এইযুগে প্রথম শল্যচিকিৎসার সূচনা করেন। এছাড়াও ছিলেন বাগভট্ট। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম হল 'অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ' এবং 'অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা'। পশু চিকিৎসার জন্যও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'হস্ত্যায়ুর্বেদ', এই গ্রন্থে হাতির নানা প্রকার রোগের আলোচনা আছে। হাতি ছাড়াও অশ্ব বা ঘোড়ার উপর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল 'অশ্বশাস্ত্র'। গুপ্তযুগে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এই তিনটি ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ ছিল অসাধারণ সৃজনশীল। গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী সম্বলিত মন্দির স্থাপত্যের বিকাশ হয়। তিন মহলা, তিন থেকে মন্দির নির্মাণের স্থাপত্য রীতির উদ্ভাবন হয়। অজয়গড়ের পার্বতী মন্দির, সাতনার একলিঙ্গ মন্দির, ভিতরগাঁওয়ের ইঁটের তৈরি মন্দির এর উদাহরণ। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য শিল্পেও এক আত্মনির্ভর ও সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের ভাস্কর্য গান্ধার শিল্পের স্থূলত্ব, অমরাবতীর ইন্দ্রিয়বাদ অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয় স্তরে পৌঁছে ছিল। প্রাণহীন প্রস্তরে জীবনের স্পন্দন এনে গুপ্ত শিল্পীরা ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। সারনাথ ও মথুরার বৌদ্ধ মূর্তিগুলি তাদের অক্ষয় কীর্তির অসামান্য নিদর্শন। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র পৃথিবীর চিত্রকলার ইতিহাসে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। অজন্তার দেওয়ালে অঙ্কিত 'মা ও ছেলে', 'বোধিসত্ত্ব' প্রভৃতি চিত্রগুলি দর্শকদের অভিভূত করে।

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন দিকে উন্নতির দিক লক্ষ্য করে গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু গুপ্তযুগ আদৌ 'সুবর্ণযুগ' ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কারণ গুপ্তযুগের অনেক দিকগুলি উন্নত হলেও দুর্বল দিকগুলি আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। গুপ্ত শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। তাছাড়া বংশানুক্রমিক পদে নিয়োগের নীতি ও বেতনের পরিবর্তে জমিদানের নীতির ফলে সামন্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে এই সামন্ত শ্রেণি বিদ্রোহী হয়ে উঠে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। আবার ভারত-রোম বাণিজ্যের অবনতি দেশের অর্থনীতিকে অর্থনীতির অনেকটাই ক্ষতিসাধন করেছিল।

গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলি এযুগের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় দিলেও এই আপাত স্বচ্ছলতার অন্তরালে ছিল জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য। শাসকশ্রেণি, সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণি হয়তো স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করত। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই ক্ষমতা ছিল না। ফা-হিয়েন লিখেছেন যে লোকে টাকার অভাবে কড়ি দিয়ে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করত। এসময়ে সাধারণ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লোকে ইচ্ছামত জিনিসপত্র কিনতে পারত না। মনে করা হয় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অভাবেই অভাবের কারণেই সরকারি কর্মচারীদের বেতন হিসাবে জমিদান করা হত। তাছাড়া দেশের বড় বড় নগরগুলি তখন ধ্বংস হতে বসেছিল। পাটলিপুত্র নগরীর শ্রী বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, রাজগৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

সুতরাং গুপ্তযুগের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই যুগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তেমন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেনি। তাই সামগ্রিক রূপে গুপ্তযুগে গুপ্তযুগকে "সুবর্ণযুগ" বলাটা কিছুটা হলেও মাত্রাধিক অতিরঞ্জিত।